উত্তরাধিকার

দেবারতি মিত্র

১.

আমার তখন ২০/২১ বছর বয়স, কবিতার ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে একটু-আধটু জড়িয়ে পড়ছি, 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হল। হাতে এল ক'টি কবিতার বইও—'ধর্মেও আছো, জিরাফেও আছো', 'হিরন্ময় অন্ধকার', 'আমি কিরকমভাবে বেঁচে আছি', 'সহজসুন্দরী', 'দিনগুলি রাতগুলি', 'আহত ভ্রূবিলাস', 'আলোকিত সমন্বয়', 'সদর স্ট্রীটের বারান্দা' প্রভৃতি। বইগুলো উল্টে-পাল্টে স্বাভাবিকভাবেই চম্‌কে উঠলাম। কারণ ঐ ধরনের কবিতা তো আগে কখনও পড়িনি। যাই হোক, প্রসঙ্গত বলি সেই বয়সে 'সদর স্ট্রীটের বারান্দা'র কিছু কিছু কবিতা পড়ে নীলপাপড়ি- হলদেপাপড়ি ভালোলাগায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম—

'সোনালফুল রাত্রিবেলা ঝরে
সকালবেলা তুমি আমার ঘরে;
তোমাকে আমি বলতে চেয়েছিলাম
জীবন নয় জীবনসংগ্রাম।'

কিংবা

'ঘুমন্ত ঘন্টা, মরিয়ম,
তোমার দেহ ছিলো।
টানাপোড়েন সুজনি-মশারিতে
নকশা কী উড়ছিলো

কাঁদলো কে! শব্দ মরিয়ম,
আমার ভয় করে;
ঝরলো রং, আহা, তোমার রং
হৃদয় কেন এলো।'

এতদিন হয়ে গেল সেই আবেশ একটুও কাটে নি।

বেশ কিছুকাল পরের কথা, প্রণবেন্দুদা আমাদের হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে মাঝে মাঝে

আসতেন। কি করে ভালো কবিতা লেখা যায় আমার এই অপরিণামদর্শী প্রশ্নের উত্তরে, মৃদু হাসতে হাসতে তিনি বলতেন—'পড়াশুনো, দেশবিদেশ বেড়ানো, এসবের সঙ্গে নিয়মিত অনুভূতিচর্চা করা দরকার।' তখন অনুভূতিচর্চা কথাটা শুনে একটু কৌতুক লাগত, আজকাল মনে হয় ব্যাপারটা মর্মে মর্মে সত্যি। বিরতিহীন অনুশীলন ছাড়া বাইরে-ভিতরে কোথাওই সাড়া জাগে না। জানি, কোনো কবিকে একটি নির্দিষ্ট বাঁধাধরা শ্রেণিতে ফেলা অনুচিত, তবু মনে হয় প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত প্রধানত অনুভূতিনির্ভর কবি; আর সেখানেই তাঁর গুরুত্ব, সেখানেই তাঁর আশ্রয়। ১৩৮৭-র সাহিত্য সংখ্যা 'দেশ'-এ 'কবিতা ও আমি' লেখাটিতে তিনি বলেছেন, 'অনুভূতি শব্দটি আমি একাধিকবার ব্যবহার করেছি এই নিবন্ধে। সচেতনভাবেই করেছি। আমার কাছে কোনো কবিতার কবিতা হয়ে ওঠার প্রধানতম শর্ত তার অনুভূতিগ্রাহ্যতা। আবেগ, মনন, দক্ষতা কোনো কিছুকেই আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু কোনো শব্দপুঞ্জ যদি অনুভূতিগ্রাহ্য না হয়, তাকে আমি কবিতা বলতে রাজি নই।' অনুভূতির আরেক নাম মর্ম। তাঁর তুচ্ছ অনুল্লেখযোগ্য কবিতায়ও এই মর্মের ছোঁয়া সাধারণত টের পাই। হয়তো সেইজন্যই আলাদা করে তেমন বিশেষ লক্ষণ তাঁর কবিতায় দেখতে পাই না। কিন্তু শাদা পদ্মে সবুজাভার মতো নিঃসংশয় কবিত্ব তাঁর কবিতায় জড়িয়ে রয়েছে।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের বাড়ি ৩ নং রোড থেকে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস পর্যন্ত জায়গাটা তাঁর কবিতায় খুব জলজ্যান্তভাবে উপস্থিত। যাদবপুরের রাস্তাঘাট, গাড়িঘোড়া, একহারা, দোহারা, তেহারা গাছপালা, বাড়িঘর, মানুষজন, সকলেরই যাওয়া-আসা আছে তাঁর কবিতায়। সাইকেল-রিকশার হর্ণ, কাকের ডাক, রাস্তা-পেরোনো বেড়াল, তাঁর ছাত্রছাত্রী, ছবি আঁকিয়েরা, গাইয়ে-বাজিয়েরা, কবিসাহিত্যিক, বন্ধুবান্ধব সবাই আকাশ-বাতাস হয়ে মিশে আছেন তাঁর কবিতায়। কেবল অধ্যাপকেরা নেই, থাকলেও এত সূক্ষ্ম মূর্তিতে আছেন যে, আমি ধরতে পারিনি।

'এখন কী ক'রবে, তুমি ভাবো।
সমস্ত পৃথিবী কিন্তু অন্যদিকে তৈরী হয়ে আছে।
জারুলগাছের নিচে বেবি-অষ্টিনটাকে কিছুটা থামিয়ে
কারা যেন প্রকৃতির শোভা দেখছে।
দুটো মেয়ে দৌড়ুতে-দৌড়ুতে এসে, আবার দৌড়ে দৌড়ে চ'লে গেলো।
একটা ফানুস উড়লো। দুটো কাক। সন্ধে হ'য়ে আসে।'

(কার জন্যে / মানুষের দিকে)

এই অন্তরঙ্গ দৃশ্য সাধারণ, তবু সাধারণ নয়, অদৃশ্য এক চলোর্মি ব্যঞ্জনা কবিতাগুলির ভিতরে ভিতরে কাজ করে যেতে থাকে—

'কাঠগুদামের পাশে একটা ফড়িং একা
খেলা করছে।
তার দিকে দৃষ্টিপাত করো।

একটু দূরে, সাইকেল রিকশা নিয়ে
একটা লোক হয়তো তোমার জন্যে
দাঁড়িয়ে রয়েছে।
তাকে আরো কিছুক্ষণ ব'সে থাকতে বলো।'

(ফড়িং / অন্ধ প্রাণ, জাগো)

চিরপরিচিত দৃশ্য ও তার পটভূমি মাঝে মাঝে কিরকম বদলে যায়, নিভৃতচারী কল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে।

'সপ্তাহে দুবার যাই গর্চারোডে পালক ফেরাতে—
ভালো কি ভালো না, আমি আজও বুঝতে পারিনি,
শুধু জানি যেখানে অসুখী যায়, যেখানে মানুষ
পর্দা-ঠেলার মতো সূর্যাস্ত সরিয়ে খোঁজে কোথায় ময়ূর,'

(যেভাবে অসুখী যায় / হাওয়া, স্পর্শ করো)

সূর্যাস্তের পরের কথা ভাবলে সাধারণত মনে আসে ছায়া, অন্ধকার, কিন্তু এখানে ময়ূরের অনুষঙ্গে যে বর্ণাঢ্য শোভা, বিহ্বলতা ঘন হয়ে উঠেছে অসুখী মানুষ নির্জ্ঞানে তার স্বপ্ন দেখতে চায়।

কোনো কোনো লেখার যুক্তিপরম্পরা অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ না করে শুধু কবিত্বটুকু উপভোগ করি—

'এক টুকরো ফল আজো মুখে স্বাদ আনে—এই রহস্য! বাগানে,
ভাঙা-চাঁদ যতু ভালোবাসে তার ডানা নেই না'হলে উপরে
কিছুটা নিশ্চিত যেতো মানুষও তো অংশত খেচর, ডানা নেই,
যতুর মতন এতো উড়ুক্কু বালকের ডানা নেই কেন—তাও রহস্য, এখানে

নাসপাতি খাওয়া যায়, খাস চন্দ্রভাগা থেকে উড়ে আসে মরাল বাহিনী।

(জ্যোছ্নায় এক টুকরো ফল ও একটি শিশু / শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়)

এর নিরানব্বই শতাংশই বুঝি না, কিন্তু একাধিকবার পড়ি।

অনেকরকম মৃত্যু আছে পৃথিবীতে, অনেকরকম জীবনও। এই অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে যাবার অভিজ্ঞতা কবি প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কাছে এক অনায়াস প্রক্রিয়ার মতো—

'কয়েকবার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যেতে হয় ব'লে
প্রতিবার জীবনের কাছে ফিরে আসতে খুব ভালো লাগে।
নৌকো উল্‌টে প'ড়ে আছে, শব্দ করে জল উঠে আসে;
মানুষ যে শৈশবে সাঁতার শিখেছে, এই কথা
ভুললে চলে না।

একটু দূরে, সাইকেল রিকশা নিয়ে
একটা লোক হয়তো তোমার জন্যে
দাঁড়িয়ে রয়েছে।
তাকে আরো কিছুক্ষণ ব'সে থাকতে বলো।'

(ফড়িং / অন্ধ প্রাণ, জাগো)

চিরপরিচিত দৃশ্য ও তার পটভূমি মাঝে মাঝে কিরকম বদলে যায়, নিভৃতচারী কল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে।

'সপ্তাহে দুবার যাই গর্চারোডে পালক ফেরাতে—
ভালো কি ভালো না, আমি আজও বুঝতে পারিনি,
শুধু জানি যেখানে অসুখী যায়, যেখানে মানুষ
পর্দা-ঠেলার মতো সূর্যাস্ত সরিয়ে খোঁজে কোথায় ময়ূর,'

(যেভাবে অসুখী যায় / হাওয়া, স্পর্শ করো)

সূর্যাস্তের পরের কথা ভাবলে সাধারণত মনে আসে ছায়া, অন্ধকার, কিন্তু এখানে ময়ূরের অনুষঙ্গে যে বর্ণাঢ্য শোভা, বিহ্বলতা ঘন হয়ে উঠেছে অসুখী মানুষ নির্জ্ঞানে তার স্বপ্ন দেখতে চায়।

কোনো কোনো লেখার যুক্তিপরম্পরা অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ না করে শুধু কবিত্বটুকু উপভোগ করি—

'এক টুকরো ফল আজো মুখে স্বাদ আনে—এই রহস্য! বাগানে,
ভাঙা-চাঁদ যতু ভালোবাসে তার ডানা নেই না'হলে উপরে
কিছুটা নিশ্চিত যেতো মানুষও তো অংশত খেচর, ডানা নেই,
যতুর মতন এতো উড়ুক্কু বালকের ডানা নেই কেন—তাও রহস্য, এখানে

নাসপাতি খাওয়া যায়, খাস চন্দ্রভাগা থেকে উড়ে আসে মরাল বাহিনী।

(জ্যোছ্নায় এক টুকরো ফল ও একটি শিশু / শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়)

এর নিরানব্বই শতাংশই বুঝি না, কিন্তু একাধিকবার পড়ি।

অনেকরকম মৃত্যু আছে পৃথিবীতে, অনেকরকম জীবনও। এই অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে যাবার অভিজ্ঞতা কবি প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কাছে এক অনায়াস প্রক্রিয়ার মতো—

'কয়েকবার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যেতে হয় ব'লে
প্রতিবার জীবনের কাছে ফিরে আসতে খুব ভালো লাগে।
নৌকো উল্‌টে প'ড়ে আছে, শব্দ করে জল উঠে আসে;
মানুষ যে শৈশবে সাঁতার শিখেছে, এই কথা
ভুললে চলে না।

নারকোল গাছের মতো আচ্ছন্ন বিশাল
মনে হয় সব কিছু।
শুধু সমুদ্রের ডাকে ছাড়া-পাওয়া পশুর চিৎকার
আমাদের বিমূঢ়তা ছিন্ন করে ফেলে।" (টিকে থাকা / নিঃশব্দ শিকড়)

কখনও কখনও মনে হয় বেশি উপকরণ, বেশি আয়োজন, বেশি উচ্ছ্বাস-হাহুতাশ ছাড়াও আবহমণ্ডলের মতো যেন প্রাণ নিঃসাড়ে ঘিরে ফেলতে থাকে অন্ধকার, পুরোনো মাটি, ঘৃণা, ভালোবাসা—

'প্রাণ থেকে প্রাণে সাড়া চলে
চৈত্রে, অনেক রাত্রে বাঁশ-পাতা শব্দ ক'রে ঝরে।
কে যেন কোথায় সব আমাদের জন্যে শুনে যায়,
নইলে আমরা তো ঘুমিয়ে ছিলাম, প্রথমে তো কিছুই বুঝিনি।
তবু জেগে উঠতে হ'লো। বাইরে, তখন জ্যোৎস্না, নিমেষ নিহত
এরকম জোনাকিরা নিভে জ্বলে নিভে
তারপর স্পষ্ট সরে গেলো।
যা প'ড়ে রইলো, তা মাঠের ওপরে মাঠে
যোজন যোজন হাওয়া। প্রাণ আর প্রাণের প্রবাহ।'
(চৈত্রে অনেক রাত্রে / নিঃশব্দ শিকড়)

প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা, নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিচর্চার উপর কতখানি ভরসা রাখা যায়? কিছু কিছু অকিঞ্চিৎকর ঘটনা বা দৃশ্যনিচয়ের মধ্য দিয়ে তো মানুষ জীবনের সবচেয়ে নিবিড় বিন্দুকে ছুঁতে পারে—

'এই একটু আলো, ছায়া, মাটি,
ঘুরে ঘুরে খেলা করছে।

চোখ দিয়ে দেখা যায়। চোখ দিয়ে?
শুধু চোখ দিয়ে?
আমি চতুষ্পাঠী খুলে সব কিছু বোঝাতে যাবো না।'
(তর্জনী-সংকেত / অন্ধ প্রাণ, জাগো)

এ চোখ মনের চোখ। প্রায় অধরা এই ইন্দ্রিয় জন্ম দেয় অমোঘ অন্তর্দৃষ্টির—

'বিদ্যুচ্চমকে দেখা যায়—
অর্ধেক মানুষ আজ মরে আছে আমার স্বদেশে।
মরে আছে, তবু তারা কথা বলে,

বাসে ওঠে, বাস থেকে নামে,
পরস্পরের দিকে থুতু ছুঁড়ে হো-হো ক'রে হাসে।'
(বিদ্যুচ্চমকে দেখা যায় / হাওয়া, স্পর্শ করো)

আপাত-নির্বিরোধী, শান্ত প্রণবেন্দুর চোখেও সঙ্গতভাবেই ঝিলিক দিয়ে ওঠে শ্লেষ, বিদ্রূপ, জটিল বিরূপতা। কিন্তু এ ভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না, তাই অস্তির দিকে, গতির দিকে এগিয়ে চলা শুরু হয়—

'কেউ ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে
যতদূর যেতে পারে,
তারপরেও হাঁ ক'রে থাকে দুঃখ আর আনন্দ।
তরী ভাসাও।' (তরী ভাসাও / নিঃশব্দ শিকড়)

২.

নাটক যে কিসে আছে আর কিসে নেই তা কেউ হলফ করে বলতে পারে না। একদিন সার্দান অ্যাভিনিউ দিয়ে হাঁটছি ঘোর শীতের সন্ধেবেলা, দমকা বাতাসে শিউলি ঝরার গন্ধ পেলাম, বিকেলে ঘুম থেকে উঠেছি পাহাড়ী শহরে চোখের সামনে কোলের মেয়ের মতো গড়িয়ে পড়ল রাঙা অসহায় সূর্য খাদের আঁচলে, প্রান্তযৌবনা অণিমা মেয়েটির সরু গলায় খিকখিক হাসি যেন স্বর্ণশৃগালীর বাঙ্ময় চিৎকার। অবাক হবার এতে কি আছে? কিন্তু বার বার চমকে উঠি। প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতা মনে হতে পারে নির্ঝঞ্ঝাট, নিরুচ্চার স্বগতোক্তির মতোই, তেমন উত্থানপতন নেই, নেই তেমন উথালপাথাল উচ্ছ্বাস, স্বরবিকৃতি বা স্বরবিভঙ্গ। কিন্তু নতুন করে আবার তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা পড়তে গিয়ে দেখলাম গোড়া থেকেই তাঁর কবিতায় বেগুনি ফুলে লাল রঙের চমকের মতো একটা স্বতঃস্ফূর্ত নাটকীয়তা ছিল। এই প্রবণতা বিচিত্র, আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত এবং কখনও কখনও আপাত-যোগসূত্রহীন। 'ফরাসডাঙ্গা' কবিতাটি কত অন্তরঙ্গ সহজভাবে মরমিয়া আবহাওয়া তৈরি করেছিল, হঠাৎ সেখানে আকাশ থেকে অপরা প্রকৃতির নীল-ঝড়-রাক্ষসী-চুল খুলে গেল। গ্রহতারাদের স্নিগ্ধ করে দেয় যে মৃদুল হাত, মাচার সঙ্গে ফুলগুলি কষে বেঁধে দেয়, উঠোন নিকোয়, পাড়ার সজ্জন এলে খুব খাইয়ে দেয়, সদারঙ্গময় কীর্তনের দল খুলে বসে, সে কি করে এক মুহূর্তে এত অতিলৌকিক, এত ভাবস্বপ্নময় হয়ে যেতে পারে?—

'সমস্ত ধোপারা যেই কাপড় আছড়াতে হাত তুলেছে, ওপরে
তুমি বস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে অন্য-কিছু হাতে গুঁজে দাও,
খুব শব্দ ক'রে কোনো জ্যোৎস্নার প্রপাত এসে
পড়ুক পাথরে।
সব সাফ হয়ে যাক।' (ফরাসডাঙ্গা / সদর স্ট্রীটের বারান্দা)

নিজের জন্ম-উৎস যা যাবতীয় প্রাণীর শরীরমনের গূঢ় অবলম্বন, তা মাঝে মাঝে স্বাভাবিক হয়েও প্রধান অঘটন বলে মনে হয়—

'আজ দিতে হবে, দাও
আমার মুখের মধ্যে 'পুরে দাও স্তন'—
আমি এই সূর্যাস্ত-ডোবানো বৃষ্টি, ঘোর কালো রং,
জলপাইপাতার স্তূপে কাঠখড়মের মতো
পড়ে-থাকা পদচিহ্ন ভুলে
তার কাছে ছুটে যাই; তার দুই হাত ধরে টানাটানি করি।'
(জননীর সঙ্গে মুখোমুখি / মানুষের দিকে)

'পরাগের ভাই' কবিতায় নাটকীয় হিংস্র আবর্ত বড় হতে হতে ক্রমশ আমাদের চোখের বাইরে চলে যায়। মানুষের প্রতি মানুষের অকারণ বিদ্বেষ নীল বিদ্যুৎ মুষলধার বৃষ্টির মতো ফেটে পড়ে—

'পরাগের ভাই' বলে :
'দাদার দয়ায় তুমি বেঁচে আছো,
তবে কেন এত ল্যাজ নাড়ো?'
আমি এইসব শুনে সমুদ্রের দিকে চ'লে যাই।
নীল কার্পেট যেন দৌড়ে যেতে গিয়ে
কুকুরেরা, উল্‌টে পাল্‌টে সব এলোমেলো ক'রে গেছে।
এখনো শব্দ হয়—কুকুরের, সমুদ্রের, ভয়ের।
আরো একটু দূরে এসে
বালির ঢিবিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি' (পরাগের ভাই / নিঃশব্দ শিকড়)

এই তীব্র কলরোল, হৈচৈ, ঘৃণার উচ্ছ্বাস কিন্তু একটু দূরে এলে আর তেমন করে চোখে পড়ে না। তখন পরাগ আর পরাগের ভাইরা অর্থাৎ জীবনের না-বোধক দিকটা যেন ছোট হয়ে গেছে কিন্তু সমুদ্র তখনও দেখা যায় সংঘর্ষকাতর, ক্ষুব্ধ, অবশেষে জয়ী। যত প্রতিকূলতাই মাথা তুলুক না কেন জীবন কখনোও দূরে সরে যায় না, জীবন কখনোই ফুরোয় না।

নাটকের বিচিত্র চরিত্রাভিনয়ে শুধু মানুষ-মানুষী নয়, অভিনয় করছে কাঁটা বাবলার বন, বাদুড়, আবর্তকুটিল রাঙা জল, দ্রোঙ্গো, বগেরি, ভাঙা অন্ধকার মুখে কাক, পোষা খরগোশ, লাল ঘুড়ি, ঝরা পাতা, ভাঙা সাইকেল, সমুদ্র, অন্ধকার, কে নয়? 'দীঘা , ১৯৭৬ কবিতায় বিশেষ চরিত্রে আছে একটি নৌকো—

'ঝাউবনে, আহত ঘোড়ার মতো ভাঙা নৌকো বাঁধা আছে গাছের গুঁড়িতে
চাঁদ ডাক দিলে, হয়তো চীৎকার ক'রে দৌড়ে চ'লে যাবে।'

এই লঘু, অতি দ্রুত লয় নৌকোটিকে এবং কবিতাটিকে এক অভাবিত গতি দিয়েছে।

'খেলা' কবিতায় বেড়াল ও মানুষের খেলার মধ্যে তেমন কোনো মিল নেই—

'আমি ভালোবাসা চাই' বলে,
বাথরুমে একটি মেয়ে হঠাৎ কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে।
সাওয়ারের ঝর্ণা তাকে শান্তি দিতে পারে না এখন।
লাক্সের ফেনায় তার চোখ জ্ব'লে ওঠে।'

সাবানের ফেনায় চোখ-জ্বলা স্নানরতা মেয়েটির কষ্ট ও আবেশ মানুষের খেলার ধরণ কিছুটা বুঝিয়ে দেয়। বেড়াল প্রভৃতি প্রাণী কুলের মিলনখেলায় তৃপ্তি আছে, কিন্তু এই সময়ের প্রতিভূ ও বলি দ্বিপদ জন্তু মানুষের খেলার শেষে কোনো পরিণাম বা স্বস্তি নেই, এখানেই বেড়াল প্রভৃতির সঙ্গে তার তফাত। কবিতাটিকে নাটকে রূপান্তরিত করতে গেলে মানুষ ও বেড়ালদের সমান ভূমিকা দিতে হবে।

'কাছে' কবিতায় প্রাণ-অপ্রাণী কোনো অভিনেতা-অভিনেত্রীই নেই, শুধু রহস্যপ্রবণ সুগভীর এক আবহ আছে—

'কাছে, খুব কাছে আসতে দিই।
কোনো ব্যবধান, কোনো বিচ্ছেদ, আড়াল যেন কোথাও না থাকে।
লণ্ঠন উপুড় হ'য়ে পড়ে আছে, উঠোন আঁধার;
কাছে আসতে দিই—'

আপাত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াহীন সংলাপহীন এই স্বগত নাটকে ইশারাপ্রবণ দুর্জ্ঞেয় হাতছানি আমাদের কত দূরে ডাক দেয় তা যিনি বোঝবার তিনি বুঝবেন। এইভাবে প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতার নিহিত নাট্যস্রোত বয়ে চলে নিদ্রিত জীব-জন্তুরও যেমন প্রবাহিত হয় অবিরত নিশ্বাসপ্রশ্বাস।

জীবনধর্মিতা ও অনিশ্চয়তা অর্থাৎ বর্তমান সংকটময় সময়ের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে রয়েছে তাঁর কবিতায়। কখনো কখনো তাঁর প্রশ্নটাই হয়তো উত্তর, তাঁর স্থির চিন্তাশীলতার পরিণতি হয়তো সংশয়ে। কিছু কিছু মানসিক ব্যাসকূটের জট ইচ্ছে করেই ছাড়ান না তিনি, ইচ্ছে করেই রাস্তা হারিয়ে ফেলেন। সহজ হয়েও সহজ নয় প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতা। ❑

ঋণ : 'পর্বসন্ধি' পত্রিকা